Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.91-104
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাকৃতিবীক্ষা

উৎসব রায়

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Environmental hazards have now become a topic of discussion. After a long tumult it is taken for granted that the environment should be a priority in our daily thinking and behavior patterns. We have already taken a firm commitment to protect the greenery around us. This dangerous situation is not only a problem specific to one nation or one country, but it is the obvious dilemma of the whole world. This dire situation should be avoided by developing full consciousness against the occurrence of environmental hazards. Nature runs as a consistent friend in all of Rabindranath Tagore's works. He was an environmental pioneer and sought harmony between progress and conservation. Even a century ago he was eloquent about the exploitation of the environment. Decades before the environmental movement began in the West, he became concerned about human impact on the environment. This experience prompted him to write at length about his concern with the way modern man was failing to respect nature. His philosophical thinking regarding the solution of environmental problems was also very important.

Keywords: পরিবেশচেতনা, বৃক্ষরোপণ, পল্লী উন্নয়ন, যন্ত্রসভ্যতা, প্রকৃতির স্বতঃমূল্য।

২০২২ সালের বিশ্ব বায়ু গুণমান বিবরণ (World Air Quality Report) অনুসারে ঘোষিত হয়েছে পৃথিবীর সর্বাধিক দূষিত শহরগুলির বেশিরভাগ ভারতে অবস্থিত। উক্ত বিবরণ অনুসারে প্রখ্যাত ভারতের রাজধানী দিল্লীর স্থান দূষণের নিরিখে একবারে প্রথমের সারিতে। এছাড়া কলকাতা, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই যথাক্রমে এই শহরগুলি অন্যতম দূষিত বলে গণ্য হয়ে থাকে। ভারতে বায়ুদূষণের গড় পরিমাণ 2022 সালের WAQR অনুসারে ছিল 53.3 ug/m^3।[i] পরিবেশের সমস্যাকে উপেক্ষা করে তথাকথিত উন্নয়ন ও ব্যাপক শিল্পায়ন এই দূষণের অন্যতম কারণ বলে পরিবেশবিদদের অভিমত। শহরে দূষণের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিতই থেকে যাচ্ছে, পরিবেশবিদদের দ্বারা নির্ণিত বিপদসীমা অতিক্রম করে ক্রমশই দূষণ মাত্রাছাড়া হয়ে পড়ছে।

এহেন প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চিন্তা সত্যিই এক স্বর্গীয় নিসর্গের পথপ্রদর্শক হয়। রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রকৃতির সঙ্গে বর্তমান প্রকৃতির অসামঞ্জস্য ততই যেন প্রকট হয়ে ওঠে, যত আমরা রবীন্দ্রনাথের সৃজনে প্রকৃতির লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি। শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের নামে প্রকৃতির এই

ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তির পথ সত্যিই এখনো অনির্দেশিত। মানব চেতনার শুভ উন্মেষের প্রত্যাশা দুরাশায় পর্যবসিত হচ্ছে ক্রমশ।

মাত্রাতিরিক্ত কার্বন পৃথিবীর স্বাভাবিক আবহকে বিপজ্জনক করে তুলছে, তাই পৃথিবী ক্রমশ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুলের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা পৃথিবীর এই বসবাস-অযোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তর্জনী নির্দেশ করেছেন সেই উন্নত দেশগুলির প্রতি, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায় প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে বিনষ্ট করে চলেছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। মানব মনের অসচেতনতা ও লালসার দ্বিধাহীন উন্মেষই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী। রবীন্দ্রভাবনাতেও প্রকৃতির স্বাভাবিকতায় নিরন্তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির নেপথ্যে মানুষের মাত্রাহীন লোভের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে বারংবার।

অরণ্য সম্পদকে রক্ষা: রবীন্দ্রনাথের 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষণে মানুষের ভূমিকা বিষয়ক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। প্রকৃতির ক্ষমতার উপর মানববুদ্ধির বিজয় সভ্যতার পক্ষে যতখানি মঙ্গলের বার্তাবাহী, মানুষের লুব্ধতার অসংযম ততখানি সভ্যতার উপর বিস্তার করেছে অমঙ্গলের ছায়াপাত। উপরোক্ত প্রবন্ধ গ্রন্থের 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি -
"...মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।...বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারিদিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন। মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয় তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।"[ii]

'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধে প্রাচীন আর্যাবর্তের অরণ্যচারী ঋষিগণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এই নিবিড় সংযোগই সভ্যতার পথপ্রদর্শক বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল-
"যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্রে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তারাঁ এত সহজেই বলতে পেরেছিলেন-- যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং ,এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা সেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশ-সমিধ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চর্তুদিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির

ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"[iii]

তাছাড়া 'হলকর্ষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি -"পৃথিবী যখন একদিন সমুদ্রস্নানের পর জীবনধাত্রী রূপ ধারণ করল, তখন তাঁর প্রথম প্রাণের যে আতিথ্যক্ষেত্র ছিল,তা ছিলো অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে সকল দেশ মরুভূমির মতো প্রথার গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দন্ডক, নৈমিষ, খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়াবিস্তার করেছিলো। আর্য ঔপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন এইসব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলেমূলে, আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।.."[iv]

'পল্লীপ্রকৃতি'-র 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধে কবি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন বনসম্পদের ক্রম-অপ্রতুলতায় সভ্যতা তথা পরিবেশের অবক্ষয়ের বিষয়টি-
"মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইঁটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ সহজভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে।"[v]

'হলকর্ষণ' প্রবন্ধে বৃক্ষরোপণ উৎসব আয়োজনের কারণ ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের দুর্দমনীয় লোভই যে প্রকৃতি ধ্বংসের আয়োজক এবং তার পরিণতিতে সভ্যতার নিদারুণ অবস্থার কথাই বলা হয়েছে সেখানে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য দূরদর্শিতার অভাব মানবসভ্যতার বিপদগ্রস্ততার কারণ -
"পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান-কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।"[vi]

জল সম্পদকে রক্ষা: প্রকৃতিতে শুদ্ধ জলের ক্রমশ দুর্লভতা ও তজ্জনিত প্রত্যাসন্ন সংকট দুর্নিরীক্ষ্য থাকেনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে। জলদূষণের প্রতিফলরূপে প্রকটিত সমস্যাগুলিও ভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথকে। ভুবনডাঙ্গার একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁর অভিভাষণ 'জলোৎসর্গ' নামক প্রবন্ধরূপে পরবর্তীকালে প্রকাশ পায়, যেখানে জলদূষণের প্রেক্ষিতে রাবীন্দ্রিক ভাবনার উদ্বেগ লক্ষ্যণীয় -

"আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন-- যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষ্ণার্ত, মলিন, রুগ্ন, উপবাসী। ঋষি বলেছেন-হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য করো। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য- দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।-জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃশ্য-লাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে।"[vii]

বিশ্ব প্রকৃতির অঙ্গনে নিজের গভীর আনন্দ উপলব্ধির স্বরূপটি অনুভব করেছিলেন কবি, জল তথা প্রকৃতি কবি জীবনের সঙ্গে কতখানি সম্পৃক্ত, তার প্রমাণস্বরূপ 'জীবনস্মৃতি'র একটি উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে-

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদী তীরে সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশ ভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত-প্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ- তৃষ্ণার জল ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।"[viii]

ভূমি সম্পদকে রক্ষা ও কৃষির উন্নতি: রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা কেবল একটি ধারণার রূপেই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেনি, পল্লী তথা প্রাকৃতিক উন্নয়নে কর্মী রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তা ও উদ্যোগ সর্বজনবিদিত ও বহুবিশ্রুত ও বহুল-আলোচিত। 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধগ্রন্থের বহুবিধ প্রবন্ধে রাবীন্দ্রিক পরিবেশভাবনার স্বরূপ বর্তমান। 'পল্লীপ্রকৃতি', 'ভূমিলক্ষ্মী', 'উপেক্ষিতা পল্লী', 'শ্রীনিকেতন' প্রভৃতি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচেতনার পরিচায়ক। স্বদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত তৎকালীন কৃষক সমাজের উপযুক্ত পথ প্রদর্শক হওয়ার ভার যে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতেই ন্যস্ত, 'ভূমিলক্ষ্মী' প্রবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে এই ভাবনাগুলি। কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করে কৃষির মানোন্নয়নের দিকটিও তাঁর অগোচর থাকেনি-

"এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।"[ix]

রবীন্দ্রনাথের কৃষিচিন্তার বিষয়টি প্রতিফলিত হয় তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ,জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও পুত্রবন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কৃষিবিদ্যার আধুনিকতম চর্চার জন্য বিদেশ প্রেরণের মতো সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে, যাতে পল্লীকৃষকদের কৃষিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। ১৯০৬ সালে রথীন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, এবং পরবর্তীতে জামাই এবং সন্তোষচন্দ্রকেও রবীন্দ্রনাথ ওই বিশ্ববিদ্যালয় পাঠান। ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়নে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ উৎসবের আয়োজন করেন যা ১৯২৮ সালে নিয়মিতভাবে সূচিত হয় সেখানে। প্রকৃতি রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে কেবল কাব্যচর্চআর উপাদান হয়ে থাকেনি, তার অবক্ষয় তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিলো,তাই তার সাহিত্যে সেই আসন্ন বিপর্যয়ের কথাও এসেছে বারবার, তাই রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা আধুনিক পরিবেশবাদীদের কাছে প্রাসঙ্গিকতা দাবি করে।

বৃক্ষ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি: শান্তিনিকেতনে 'বৃক্ষরোপণ' উৎসবের উদগাতা রবীন্দ্রনাথ। বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁর রচিত গানগুলির মধ্যেও বৃক্ষের গুরুত্বের কথা ধ্বনিত হয়েছে বারংবার। বৃক্ষ সেখানে 'মরুবিজয়ের কেতন' উড়িয়ে শ্যামল পত্র-পল্লবে লালন করে চলেছে প্রকৃতির জীবনধারা, একদিকে সে যেমন প্রতিবেশী, তেমনি নিঃস্বার্থ বান্ধবের ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ। আবার গানে 'বালকবৃক্ষ' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে বৃক্ষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্যপূর্ণ-দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতটিও প্রসঙ্গত গুরুত্ববাহী। সন্তান স্নেহে বৃক্ষকে পরিপালনের মতো মহৎ মানসিকতা অর্জন করতে পারলে মানুষের দ্বারা বৃক্ষের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব।

"...প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভান্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণবর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।--
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগীতিকায়
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।..."[x]

বর্তমান পৃথিবীতে দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্রকৃতির স্বাভাবিক আচরণে তারতম্য মনুষ্যসৃষ্ট। মানুষই আপন লোভের বশবর্তী হয়ে একদিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক সম্পদকে যেমন বিকৃত করছে, অন্যদিকে প্রয়োজনের খাতিরে ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনের প্রয়োগ

আমাদের স্বাস্থ্যকেই বিপর্যস্ত করছে, আর এই প্রয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে মানুষের অন্তরের আকাঙ্খার ক্রমশ লোভে রূপান্তরিকরণের দ্বারা। 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধগ্রন্থের 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট উক্তি- "....আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে ভাবে-ভঙ্গিতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এইজন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে -আমরা কেবলই অকৃতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব -এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা।"[xi]

শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গনে পঠন-পাঠনের ধারণাটি রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন ভারতীয় সভ্যতার তপোবনের দৃষ্টান্ত থেকে। একাধারে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, অন্যদিকে গতানুগতিক পঠনের আনন্দহীনতা থেকে মুক্তি, এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন পঠন পদ্ধতির অভিনবত্বের মাধ্যমে। তাঁর 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় বৃক্ষকে 'আদিপ্রাণ' বিশেষণে বিশেষিত করা প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষকে প্রকৃত মর্যাদায় অভিষিক্ত করার প্রয়াস-

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।..."[xii]

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার অসারতা ও কবিগুরুর প্রকৃতি চেতনা: বিশ্বপ্রকৃতি এখন চরম সঙ্কটের মুখে পর্যবসিত। তেজস্ক্রিয়তা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ এখন যেমন মানবসভ্যতার উন্নতির ইঙ্গিতবাহী, তেমনি অন্যদিকে এই সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্নতার উপাদানও বটে। বিশ্বব্যাপী দেশগুলির ক্ষমতায়ণের খেলায় গোটা বিশ্বই আজ অস্তিত্ব সংকটের সিংহদরজায় এসে উপনীত। নগরায়ণের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ বিনাশ ভারসাম্য বিকৃত করছে প্রকৃতির। এই নাগরিক লৌহ-লোষ্ট্রের আধুনিকতার চেয়ে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার তপোবনের নিস্তরঙ্গ যাপনই শ্রেয়তর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের –

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান..."[xiii]

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রাণপুরুষ। ছাত্রদের পল্লীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ও শান্তিনিকেতনের পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথেরই চেতনা-উদ্ভূত। গ্রাম সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতি সমালোচকদের প্রশ্ননিক্ষেপের প্রয়াসকে তিনি কটাক্ষ করেছেন -"লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে- 'উনি তো ধনী ঘরের ছেলে ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লী গ্রামের কথা উনি কি জানেন?' আমি বলতে পারি- আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কি দিয়ে জানেন তারা, অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়? যথার্থ জানাই ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট সে জানে না ফুলকে। জানে বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসা দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে।"[xiv]

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম রূপক-সাংকেতিক নাটক 'মুক্তধারা' -য় যন্ত্ররাজ বিভূতির বৃহদাকার যন্ত্র-নির্মাণ দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মুক্তধারার জল অবরুদ্ধ করার রূপকে যন্ত্রক্ষমতার অপব্যবহারের দরুন জনজীবনের বিপন্নতাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন অপরূপভাবে। উত্তরকূটের রাজশক্তির শিবতরাই অঞ্চলের প্রতি আধিপত্য লিপ্সার পূরণে যন্ত্র অবতীর্ণ হয়েছে সহায়করূপে-
"দূত: যন্ত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি: কী তাঁর আদেশ?

দূত: এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে–

বিভূতি: তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সর্ম্পূণ হয়েছে।

দূত:শিবতরাইয়ের প্রজারা এখন এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি: দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত: তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত–

বিভূতি: চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত: সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি: বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে- কথা ভাববার সময় ছিল না।"[xv]

যন্ত্রসভ্যতার অসংযত উল্লাসে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা স্খলনের বীভৎসতাকে উপলব্ধি করে উপরোক্ত নাটকেই যন্ত্রের প্রতি একটি গান গীত হয়েছে, যেখানে যন্ত্রের প্রতি নির্দেশিত বিশেষণগুলি সভ্যতার বিস্তীর্ণ সীমায় তার প্রভাবটির দিকে ইঙ্গিত করে, সেখানে যেমন যন্ত্রের ইতিবাচকতার দিকটি বর্ণিত, তেমনি 'ধ্বংসবিকটদন্ত'-সহ তার বিধ্বংসী স্বরূপটিও উন্মোচিত -

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংসবিকট দন্ত।..."[xvi]

যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে ব্যথিত প্রকৃতির ভবিষ্যৎ পরিণতিকে স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ- "কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষায় মানুষকে মানুষ মারত, কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘ যুগের ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর-এক তীর অধিকার করে থাকত। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শতসংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা-- সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ্, তার ললিতকলা।"[xvii]

মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে ও বিচিত্র উন্নয়নের প্রত্যাশী হয়ে যে নগর সৃজন করেছিল,তা বর্তমানে সভ্যতার, সংস্কৃতির ও উন্নয়নের পীঠস্থানরূপে স্বীকৃত পৃথিবীর সর্বত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার সূচনালগ্নে তপোবনের ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এক স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায়, যেখানে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রাণের আশ্চর্য সঙ্গমে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো ভারতীয় সভ্যতা। কেবলমাত্র নগরায়নই উন্নতির পরিপ্রেক্ষিত রচনা করতে পারে, এখানে ভ্রান্ত ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছেন প্রাচীন আর্যাবর্তের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে- "কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল

প্রস্রবন শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিন্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখনে গাছপালা নদী সরোবর মাদুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।"[xviii]

আবার প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতা মানব জীবনে যে বীভৎস সংকটের সূচনা করে এবং লোভের প্রহেলিকা মানুষের জীবনকে কীভাবে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে অনায়াসে, তারই অনুরণন শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের বহুবিশ্রুত নাটক 'রক্তকরবী'তে। যক্ষপুরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্নতা থেকে এই নাটক এগিয়ে চলে বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণিল পরিণতির দিকে। ভূগর্ভস্থ সোনার লোভে বিশ্ব প্রকৃতির সান্নিধ্য ছেড়ে যারা যক্ষপুরীতে শ্রমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো, মকররাজের ব্যক্তিগত লোভের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে তারা পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলো উপকরণমাত্র। তাদের দ্বারা মকররাজ স্বর্ণ খনি থেকে সোনা উত্তোলন করতো এবং শ্রমের বিন্দুমাত্র বিরতিতে তাদের উপর নেমে আসতো অসহনীয় অত্যাচার। বলা বাহুল্য, কেবল যক্ষপুরীর শ্রমিক নয় , স্বয়ং মকররাজও বিশ্বপ্রকৃতির স্নেহাঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয়েছিল ক্ষমতার এক পুত্তলিকায়। মকররাজের শাসন-কাঠামোয় তার অন্যতম এক সহচর অধ্যাপকের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের বার্তা বহনকারী নন্দিনী চরিত্রের কথোপকথনটি লক্ষ্যণীয়-

"নন্দিনী: আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক: দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ির ধন-- সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী: বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক: সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী: অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক: আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।"[xix]

মানুষ যে ক্রমশ স্বেচ্ছাচারিতায় মগ্ন হয়ে নিজেদের প্রতিবেশে প্রকৃতির অপ্রতুলতার কারণ হয়েছে, তা উপলব্ধি করেছেন কবি, কিন্তু মানুষের এই আচরণ যে প্রত্যাসন্ন দুর্দিনকেই ত্বরান্বিত করবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় -"মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা, সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে,এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্য-নিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে,সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।"[xx]

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতীয় কাব্য থেকে তার যথার্থ উত্তরসূরি রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতি এক প্রধানতম ও অকৃত্রিম প্রেরণা রূপে দেখা দিয়েছে সর্বত্র। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কাব্যজগতেও কোথাও নিগূঢ় রসব্যঞ্জনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে চিত্রকল্প রচনার উপাদান হিসাবে, আবার কোথাও বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রকৃতির অবারিত আনাগোনা। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, যার বীজ নিহিত আছে পদ্মাবিধৌত বাংলাদেশের লাবণ্যময় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, সেখানেও বহুমুখী রবীন্দ্র-সৃজনের মধ্যে প্রকৃতিচেতনা অন্তঃসলিলা নদীর মতো বহমান। 'বলাই' গল্পটির প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের পল্লীসমাজ থেকে বহুদূরবর্তী হলেও, তাঁর প্রকৃতি চেতনার স্বরূপটি এখানে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। একটি শিমূল গাছকে কেন্দ্র ক'রে বলাই চরিত্রের বিকাশ অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যে বলাই তাই একজন ব্যতিক্রমী সংবেদনশীল চরিত্র হিসেবেই পরিচিতি পাবে চিরকাল। আধুনিক প্ল্যান্ট বায়োলজিস্ট ও একবিংশ শতকের পরিবেশবাদীদের সঙ্গে এখানে রবীন্দ্র ভাবনার তরঙ্গ দ্রাঘিমার মিলন দেখা দিয়েছে -

"কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এইটা সে বুঝেছে। এইজন্য ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে আমলকি পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু'পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়- ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সবচেয়ে বিপদের দিনে যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা,ঘাসের ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেরিয়েছে- এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলদে নামহারা ফুল,তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটু সোনার ফোঁটা, বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল;পাখিতে খাওয়া নাস্বারের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে,কী সুন্দর তার পাতা - সমস্তই

নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।.."[xxi]

বর্তমান সমাজে রবীন্দ্র ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা: বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্যের বিঘ্নতা আজ সারা পৃথিবীতেই আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, প্রতিনিয়ত সন্ধান চলছে প্রতিবিধানের, কেননা সমাধান ভিন্ন এই পৃথিবী ক্রমশ মানুষের বাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে, তা বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের দূরদর্শীতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই পুনরায় রবীন্দ্র ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ও পুনরায় সেই ভাবনার দিকে ফিরে দেখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশ, তাই রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা বিদ্বতমহলে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিবেশচিন্তা প্রয়োগহীনতায় ক্ষান্ত থাকেনি, তাই তার প্রয়োগ সংক্রান্ত ভাবনাও প্রয়োজন। রবীন্দ্র দর্শনের মূলে রয়েছে প্রকৃতির উপাদানগুলিকে প্রতিবেশী হিসেবে মানুষের স্বীকৃতিদান ও তদানুযায়ী আচরণ। মানুষ বিশ্বের প্রভু, এই ধারণায় আন্তর্জাতিক মানসিকতাসম্পন্ন একজন স্রষ্টার বিশ্বাস থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। যন্ত্রসভ্যতার ভয়ানক দিকটি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, তাঁর সৃষ্টিতে সেই প্রমাণ বর্তমান। নগরায়ন ও শিল্পায়নের নামে প্রকৃতির উপর মানুষের অনিয়ন্ত্রিত আধিপত্য যে সভ্যতাকে পতনোন্মুখ করে তুলছে, রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়ও অবগত ছিলেন যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় ষড়ঋতুর যে মাধুর্য চিত্রিত, অধুনা পরিবেশের সঙ্গে তার সূত্র সন্ধান কষ্টকর, কারণ রবীন্দ্র সমকালের প্রকৃতির থেকে বর্তমান প্রকৃতি বহু-বিবর্তিত ও ক্ষতিগ্রস্ত,তাই ঋতুর আবর্তনে আসছে অস্বাভাবিকতা।

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী কবি, চরম দুঃখ-দুর্দশাজনিত নৈরাশ্যের মধ্যেও তিনি মঙ্গলের প্রত্যাশা ছাড়তে পারেন না, মানব চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রেও তিনি এই ভাবনার ব্যতিক্রমী হতে পারেননি। মনুষ্যকৃত ধ্বংস-ক্ষতের উপর কল্যাণের প্রলেপ দেওয়ার ক্ষমতা যে মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান সেই বিশ্বাস থেকে তিনি চ্যুত হতে পারেননি- "যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট-- যা এত বীভৎস রকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।"[xxii]

গভীর বাস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন: নরওয়ের দার্শনিক Arne Naess 1970 সালে পরিবেশগত সংকটের কেন্দ্রে মানুষকে উপস্থাপন করার সময় প্রকৃতিতে মানুষের ভূমিকাকে বোঝার জন্য গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[xxiii] Arne Naess মনে করেন- এটি একটি আন্দোলন। একটি অগভীর বাস্তুতন্ত্র (shallow ecology) কিন্তু বর্তমানে খুবই শক্তিশালী একটি আন্দোলন। অন্যটি গভীর বাস্তুতন্ত্র (deep ecology) কিন্তু তুলনামূলক কম শক্তিশালী একটি আন্দোলন, যা আমাদের মনোযোগের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। গভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে পৃথিবীতে মানুষ ও মানুষ ছাড়া সকল জীবের মঙ্গল ও বিকাশের স্বতঃমূল্য আছে। এই মতটি সামগ্রিকভাবে জীবজগত বা বস্তুজগতের ক্ষেত্রে বলা যায়। এর মধ্যে সকল ব্যক্তি, প্রজাতি, জনসংখ্যা, বাসস্থান, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুই পড়ে। বাস্তুতন্ত্রের সকল উপাদানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। এর ফলে আমরা বলতে পারি, এই সকল

উপাদানের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ এবং প্রকৃতির সকল উপাদানের ভালো থাকাকে নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। প্রাকৃতিক বিষয়গুলির মধ্যেও এমন এক স্বতঃমূল্য আছে যা আমাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, অভিপ্রায় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে। তাই পৃথিবীতে মানুষের যেমন স্বতঃমূল্য আছে তেমন মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী এমনকি আপাতদৃষ্টিতে জড়বস্তুরও স্বতঃমূল্য আছে। এগুলির উপযোগিতা মানুষের কাছে একরকমের হলেও তার দ্বারা স্বতঃমূল্য বিচার্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে বঝা যায় তিনি প্রকৃতির স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করেছিলেন। প্রকৃতির স্বতঃমূল্য অস্বীকার ক'রে মানুষ কেবল আপন চরিতার্থতায়, সৌন্দর্যবোধের ক্ষুদ্র সীমানায় প্রকৃতির বিচার করেছে, প্রকৃতির লাবণ্য বৈচিত্র্যের প্রতিটি অংশই যে প্রয়োজনীয়, সেই স্বতঃমূল্যকে মানুষ অস্বীকার করেছে অনায়াসে। তাই যে ফুল মানুষের প্রয়োজনে লাগেনি, মানুষের সৌন্দর্যবোধের মানদন্ডগুলোকে অবহেলা করেছে সেগুলির গুরুত্ব মানুষ স্বীকার করেনি। 'বনবাণী ' - র 'কুরচি' কবিতায় কবি বলেছেন -

"কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভুজা ভারতীয় বীণা
তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকারঝংকারিত
কাব্যের মন্দিরে।"

মানুষের এই আচরণের কারণও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন -

"হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে, পণ্ডিতের পুঁথির পাতায়;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয় নি আজও লেখা,
গানে পায় নাই সুর।"[xxiv]

চিকিৎসায় বা গ্রন্থে সেই কুরচি ফুলের নামোল্লেখ নেই, পদ্মের মতো তার খ্যাতি নেই, অর্থাৎ মানুষকে তুষ্ট করতে পারে এমন কোনো বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বিদ্যমান নয় বলেই, সে চির উপেক্ষিত। এখানে প্রকৃতির উপাদানের মূল্যায়ন হয় মানুষের চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয়তার মানদন্ডে। আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনার বিষয়টি ও প্রকৃতির স্বতঃমূল্যের স্বীকৃতি একদিকে যেমন শৈল্পিক ক্ষেত্রে বিকাশমান, অন্যদিকে তাঁর আয়োজিত কর্মযজ্ঞেও প্রকৃতির উপস্থিতি। হলকর্ষণ বা বৃক্ষরোপণের মতো উৎসবগুলি তাঁর স্বকপোলকল্পিত। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ তাঁর কাছে ছিলো আদর্শ,তপোবনের ধারণা তাঁর শান্তিনিকেতন পরিকল্পনার প্রধানতম উপাদান। মুক্ত প্রকৃতির সম্পৃক্তি ব্যতীত শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ, সেই বিষয়টি তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বাল্যকালে গৃহবন্দী জীবনে তাঁর প্রকৃতির মাঝে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতার কথা

রয়েছে -'জীবনস্মৃতি' -তে "সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানলার নানা ফাঁক-ফুকুর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত সে যেন গড়াদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ- মিলনের উপায় ছিল না সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"[xxv]

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই নিবিড়তম সংযোগ এই বিশ্বপ্রকৃতির এবং প্রকৃতির এই অনাবিল লাবণ্যের নব নব আবিষ্কারের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যের নতুন নতুন উদ্ভাস। পরিবেশের ক্রমবিস্তৃতমান বিপর্যয়ের দারুণই এমন সাহিত্য ভাবনার জন্ম। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি এবং চিনেছি চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। তাঁর সঙ্গীতকোষগ্রন্থে বিষয় হিসাবে 'প্রকৃতি' একটি স্বতন্ত্র পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত। আবার 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'-র মতো নাটকে তিনি বারবার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যন্ত্রসভ্যতার আপাত সুবিধার অন্তরালে নিহিত প্রত্যাসন্ন দিনের অশনিসংকেত, প্রকৃতির লীলাপ্রাঙ্গনে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন সেখানে ব্যথিত করেছে কবিকে। আবার ছোট গল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় 'অতিথি' গল্পের তারাপদ চরিত্রটি কোথায় যেন হয়ে উঠেছে প্রকৃতির সমধর্মী, তাই কিছুটা উদাসীন ও নির্লিপ্ত। আবার বলাই গল্পের বলাই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য সৃষ্টি যেখানে সংবেদনশীল মনের অধিকারী হয়েও সে তার সমগ্র কৈশোর জুড়ে বন্ধুদের কাছ থেকে কেবল পেয়েছে বিদ্রুপ তার গাছেদের প্রতি আশ্চর্য আত্মিকতা অনুভবের কারণে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে পরিবেশ বারংবার এবং স্বাভাবিকভাবেই ফিরে-ফিরে এসেছে কখনো প্রত্যক্ষ এবং কখনো পরোক্ষভাবে। জীব ও জড়ের পারস্পরিক সম্পর্কের যে মতটি ডারউইন তার অভিব্যক্তিবাদে ব্যক্ত করেছিলেন, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্য। আবার তার 'ছিন্নপত্র'-এ আমরা বারংবার দেখতে পাবো রবীন্দ্রনাথের সেই প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা, এবং চিঠির পাতায় পাতায় তার অভূতপূর্ব এবং নিবিড় প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

i. 2022 World Air Quality Report অনুসারে।
ii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৭৩।
iii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৯১।
iv. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৮১।
v. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৭৩।
vi. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৮২।
vii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪০১।
viii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৮৮।
ix. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৬০।
x. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১১৬।
xi. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৯২।
xii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৮৯-৯০।
xiii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৮।
xiv. ১৯৪০ সালের ২ মার্চ বাঁকুড়ার এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে কবিগুরু একথা বলেন।
xv. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।
xvi. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৩৮।
xvii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৮২।
xviii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৯০।
xix. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৫৮।
xx. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৯২-৬৯৩।
xxi. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ,বলাই, লেখাপড়া, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৬৫৮।
xxii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৮২।
xxiii. Arne Naess, Inquiry, Vol-16, University of Oslo, 1973, Pg. 95-100.
xxiv. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৯৭-৯৯।
xxv. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪১৫।